পাক্ষিক

আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শাফায়তকারী নাই অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক : এ. এইচ. এম. আলীআনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৭ বর্ষ ॥ ৭ম সংখ্যা

২৯শে শ্রাবণ ১৩৯০ বাংলা ॥ ১৫ই আগষ্ট ১৯৮৩ ইং ॥ ৬ই জেলকদ ১৪০৩ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী — ১৫ই আগষ্ট ১৯৮৩ — ৩৭শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা আল-আনআম (৮ম পারা, ১৬শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'সত্যের আহ্বান ও প্রচার'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী : 'নামাজের তাৎপর্য ও উহার হেফাজত'	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৭
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আমহদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৬
* পবিত্র কুরআন ও বিজ্ঞান : (৪)	অনুবাদ : মোঃ খলিলুর রহমান	১৭
* সংবাদ :		২২

বিজ্ঞপ্তি

বন্ধুগণ জানিয়া আনন্দিত হইবেন যে, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ১৯৮৩-৮৪ মালী বৎসরের আয় ও ব্যয়ের বাজেট হযরত আকদাস খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) মঞ্জুরী প্রদান করিয়াছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

বন্ধুগণ চলতি আর্থিক বৎসরের (১৯৮৩-৮৪) বাজেট প্রণয়ন করিয়া অবশ্যই আগামী ৩১শে আগষ্ট '৮৩ তারিখের মধ্যে অত্র দপ্তরে প্রেরণ করিবেন। বাজেট প্রণয়নে হুজুর আকদাস (আইঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক উপার্জনশীল আহমদীকে অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে এবং তাহার প্রকৃত আয়ের উপরে নিয়মিত হারে চাঁদা ধরিতে হইবে। কেহ পূর্ণ হারে চাঁদা না দিতে পারিলে সে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের খেদমতে মুয়াফীর দরখাস্ত দিতে পারিবে।

এই প্রসংগে আরো জানান যাইতেছি যে, বিগত ১৫ই জুলাই '৮৩ তারিখের সার্কুলার মোতাবেক জামাতের আদায়কৃত সকল প্রকার চাঁদা "বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীদা"-র অনুকুলে ব্যাংক ড্রাফট করিয়া পাঠাইবেন।

খাকসার—

এ. কে. রেজাউল করিম, সেক্রেটারী ফাইনান্স
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৭ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

১৫ই আগষ্ট ১৯৮৩ইং : ২৯শে শ্রাবণ ১৩৯০ বাংলা : ১৫ই জহুর ১৩৬২ হিঃ শামসী

সুরা আল-আনআম

[ইহা মক্কী সুরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ইহার ১৬৬ আয়াত ও ২০ রুকু আছে]

অষ্টম পারা **১৬শ রুকু**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৩১। হে জিন্ ও ইনসানগণের জামাত! তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকট কি রসুলগণ আসে নাই, যাহারা তোমাদিকে আমার আয়াতসমূহ পড়িয়া শুনাইত এবং তোমাদিগকে তোমাদের আজিকার এই দিবসের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করিত? তাহারা বলিবে, আমরা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছি; এবং পার্থিব জীবন তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে এবং তাহারা নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেরাই সাক্ষ্য দিবে যে, তাহারা কাফের ছিল।

১৩২। (এই রসুলগণকে পাঠানোর) উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে তোমার রব্ব শহরগুলিকে উহাদের অধিবাসীগণের গাফেল অবস্থায় যুলুমের সহিত ধ্বংস করিতে পারিতেন না।

১৩৩। এবং সকল ব্যক্তি (বা জাতি)-র জন্য তাহাদের আমল অনুযায়ী বিভিন্ন পদমর্যাদা আছে তোমাদের রব্ব সে সম্বন্ধে গাফেল নহেন, যাহা তাহারা করিতেছে।

১৩৪। এবং তোমার রব্ব কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন তিনি রহমতওয়ালা তিনি চাহিলে তোমাদিগকে বিলুপ্ত করিতে পারেন, এবং তোমাদের (বিলুপ্তির) পরে যাহাদিগকে তিনি চাহিবেন তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন যেভাবে তিনি অন্য জাতির বংশধর হইতে তোমাদের উদ্ভব করিয়াছেন।।

১৩৫। নিশ্চয় যে বিষয়ে তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে, উহা অবশ্যই ঘটিবে এবং তোমরা কিছুতেই উহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না।

১৩৬। বল! হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের পন্থ অনুযায়ী আমল কর আমিও (আমার নিয়ম অনুযায়ী) আমল করি তারপর অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে যে, এই (পার্থিব) গৃহের পরিণাম কাহার পক্ষে (কল্যাণকর) হয়; প্রকৃত কথা, যে যালেমগণ কখনও সফলকাম হয় না।

১৩৭। এবং তাহারা আল্লাহর জন্য সেই ফসল ও চতুষ্পদ জন্তু হইতে যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এক অংশ নির্দিষ্ট করিয়াছে তারপর তাহারা নিজেদের ধারনা অনুযায়ী বলে যে, এই পরিমান আল্লাহ্‌র জন্য এবং এই পরিমান আমাদের শরীকদের জন্য, কিন্তু তাহারা দাবীও করে যে অংশ তাহাদের শরীকগণের জন্য, উহা আল্লাহ্‌র নিকট পেঁৗছে না. এবং যে অংশ আল্লাহ্‌র জন্য, উহা তাহাদের শরীকগণের নিকট পৌছে তাহারা কত মন্দ বিচার করে।

১৩৮। এবং এইরূপে মোশরেকগণের মধ্য হইতে অধিকাংশকে তাহাদের শরীক (দেবতা) গণ তাহাদিগকে ধ্বংস করার জন্য এবং তাহাদের দীনকে তাহাদের নিকট সন্দেহ যুক্ত করার জন্য নিজেদের সন্তানদিগকে হত্যা করা মনোরম করিয়া দেখাইয়াছিল এবং যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে তাহারা অর্থাৎ (মোশরেকগণ) এরূপ করিত না, অতএব তুমি তাহাদিগকেও এবং তাহাদের মিথ্যাকেও উপেক্ষা কর।

১৩৯। এবং তাহারা তাহাদের ধারনা অনুযায়ী বলে, উমুক উমুক চতুষ্পদ জন্তু ও ফসল (খাওয়া) নিষিদ্ধ, উহা কেবল ঐ ব্যক্তি খাইবে যাহাকে আমরা (খাইতে) বলিব; এবং (তাহারা বলে যে) কতক চতুষ্পদ জন্তু আছে যাহাদের পিঠ (চড়ার জন্য) হারাম করা হইয়াছে, এবং কতক চতুষ্পদ জন্তু আছে যেগুলির উপর (জবেহ করিবার সময়) তাহারা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে না, (তাহাদের এসব কার্যকলাপ) তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা স্বরূপ; তিনি অচিরেই তাহাদিগকে সেই মিথ্যার জন্য শাস্তি দিবেন, যাহা তাহারা রচনা করিতেছে।

১৪০। এবং তাহারা বলে, এই সকল চতুষ্পদ জন্তুর গর্ভে যাহা কিছু আছে, উহা কেবল আমাদের পুরুষগণের জন্য এবং আমাদের স্ত্রীগণের জন্য উহা হারাম করা হইয়াছে কিন্তু যদি উহা মৃত হয়, তবে তাহারা (স্ত্রী-পুরুষ) সকলেই উহাতে অংশীদার হয়, অচিরেই তিনি তাহাদিগকে তাহাদের কথার জন্য শাস্তি দিবেন, নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ।

১৪১। নিশ্চয় তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে যাহারা নির্বুদ্ধিতাবশতঃ না জানিয়া নিজেদের সন্তানদিগকে হত্যা করিয়াছে এবং আল্লাহ তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন, তাহারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করিয়া উহা (নিজেদের উপর) হারাম করিয়াছে; নিশ্চয় তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং তাহারা হেদায়াত প্রাপ্ত ছিল না। (ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে পবিত্র কোরআনের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাত শত আদেশের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল।" (আমাদের শিক্ষা)—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) নুবাদ।

হাদিস শরীফ

সত্যের আহ্বান ও প্রচার, উপদেশ ও সৎপথের নির্দেশ

(১) হযরত সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ আঃ) হযরত আলী (রাঃ -কে বলিয়াছিলেন :

'খোদার কসম, তোমার দ্বারা কোন একজন ব্যক্তিরও হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়া, তোমার পক্ষে উৎকৃষ্ট লাল বর্ণের উঁট পাওয়া অপেক্ষাও শ্রেয়।" (মুসলিম)

(২) হযরত আবু হুরায়রাহ (রাজিঃ) বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ আঃ) বলিয়াছেন : "যে ব্যক্তি কোন নেক কাজ এবং হেদায়েতের দিকে মানুষকে আহ্বান করে, তাহাকেও ততটুকু সওয়াব দান করা হইবে, উহার উপর আমলকারী যতটুকু সওয়াব লাভ করিবে, এবং তাহাদের উভয়ের সওয়াবে কোনরূপ ত্রুটি ঘটিবে না। তেমনি ভাবে যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ এবং পথভ্রষ্টতার দিকে মানুষকে আহ্বান করে, তাহারও ততটুকই গোনাহ হইবে, যতটুকু গোনাহ সেই মন্দকাজ সম্পাদনকারীর হইয়া থাকে এবং ইহায় তাহার গোনাহতে কোন ত্রুটি ঘটিবে না।" (মুসলিম)

(৩) হযরত মায়ায (রাজিঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ আঃ) আমাকে রাষ্ট্রনায়ক করিয়া প্রেরণ করিলেন এবং বলিলেন : তোমাকে অনেক সময় আহলে কেতাব (খীষ্টান ও ইহুদী) গণের সম্মুখীন হইতে হইবে। তুমি তাহাদিগকে তখন এই কথার প্রতি আহ্বান জানাইবে যে, তাহারা যেন সাক্ষী দেয়, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং আমি (মোহাম্মদ সাঃ আঃ) আল্লাহর রসুল। যদি তাহারা তোমার এই কথা মানিয়া লয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে বলিবে যে, আল্লাহতায়ালা তাহাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা ফরজ করিয়াছেন। যদি তাহারা তোমার এই কথা কবুল করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে বলিবে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের উপর সাদকা (অর্থাৎ আর্থিক কুরবানী) দেওয়া ফরজ করিয়াছেন, যাহা তাহাদের বিত্তবানদের নিকট হইতে লওয়া হইবে এবং তাহাদের দরীদ্রদিগকে দান করা হইবে। যদি তাহারা ইহাও মানিয়া লয়, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের উৎকৃষ্ট মাল লওয়া হইতে বিরত থাকিবে। মজলুমের দোওয়া হইতে বাঁচিও, কেননা মজলুমের দোওয়া এবং আল্লাহতায়ালার মধ্যে কোন ব্যবধান বা প্রতিবন্ধকতা নাই। অর্থাৎ, উহা সরাসরি আল্লাহর দরবারে পৌঁছায় এবং কবুল হইয়া যায়।" (বোখারী)

(৪) হযরত আনাস (রাজিঃ) বর্ণনা করেন যে নবী করীম (সাঃ আঃ) বলিয়াছেন : "মানুষের জন্য সহজ সরল অবস্থার সৃষ্টি করিবে, অসুবিধা ও কাঠিন্যের সৃষ্টি করিবে না ; তাহাদিগকে সুসংবাদ দান করিবে, নিরাশ করিবে না।" (মুসলিম)

['হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত]

অনুবাদ :—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃতবাণী

নামাজের তাৎপর্য ও উহার হেফাজত

মুমিনের প্রতিটি মূহূর্ত ইয়াদে-ইলাহীতে অতিবাহিত হয়। তাহারা ক্ষণিকের জন্যও তাহা হইতে গাফিল হয় না।

তাহারা নামাজের রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং উহাকে স্বীয় প্রাণাধিক প্রিয় জ্ঞান করে।

"والذين هم على صلواتهم يحافظون"—অর্থাৎ (মুমিনগণ) তাহাদের নামাজের হেফাজতকারী এবং যত্নবান হইয়া থাকে। অর্থাৎ কাহারও স্বরণ করাইয়া দেওয়ার মুখাপেক্ষী থাকে না। বরং এমন এক সংযোগ ও সম্পর্ক তাহাদের খোদার সহিত গড়িয়া উঠে এবং খোদাতায়ালার স্বরণ এমন স্বভাবসুলভ প্রিয় এবং শান্তি স্বস্তি এবং জীবনের ভিত্তি ও নির্ভরযোগ্য বস্তুতে পরিণত হয় যে, তাহারা সর্বক্ষণ উহার সংরক্ষণ ও তত্বাবধানে নিয়োজিত থাকে এবং তাহাদের প্রতিটি মূহূর্তও ইয়াদে-ইলাহীতে অতিবাহিত হয়। এক মূহূর্তও তাহারা খোদাতায়ালার স্বরণ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে চায় না।

ইহা স্পষ্ট যে, মানুষ সেই জিনিসেরই হেফাজত এবং তত্বাবধানে সর্বত্মাক শক্তি প্রয়োগে নিয়োজিত থাকে, যে জিনিসটি হারাইলে সে তাহার বিনাস ও ধ্বংস বলিয়া জ্ঞান করে। যেমন এক মুসাফের যে এক তরু-লতাহীন মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়া সফর করিয়া চলিয়াছে, যে প্রান্তরে সহস্র সহস্র মাইল ব্যাপী পানি ও খাদ্য পাওয়ার কোন আশা নাই, সে তাহার নিকট রক্ষিত পানি ও খাদ্যের সযত্নে হেফাজত করে এবং উহাকে নিজের প্রাণতুল্য জ্ঞান করে। কেননা সে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে যে, উহা বিনষ্ট হইলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য।

সুতরাং যাহারা এইরূপ মুসাফেরের ন্যায় নিজেদের নামাজের হেফাজত করে এবং যদিও ধন-সম্পদ বা সম্মান-সম্ভ্রমের ক্ষতি সাধিত হয় কিম্বা নামাজের জন্য কেহ অসন্তুষ্ট হয়, তথাপি তাহারা নামাজ পরিত্যাগ করে না এবং উহা বিনষ্ট হওয়ার আশংঙ্কায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও উৎকুণ্ঠিত থাকে যেন মৃত্যু মুখে পতিত হয়, এবং তাহারা এক মুহূর্তও আল্লাহর স্মরণ হইতে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হইতে চায় না। প্রকৃতপক্ষে তাহারা নামাজ ও ইয়াদে-ইলাহীকে নিজেদের এক অত্যাবশ্যকীয় পাথেয় বলিয়া জ্ঞান করে, যাহার উপর তাহাদের জীবন নির্ভরশীল। এরূপ অবস্থা তখনই সৃষ্টি হয়, যখন খোদাতায়ালা তাহাদের সহিত

প্রেম করেন এবং তাঁহার সাক্ষাৎ প্রেমের এক প্রজ্জলিত শিখা, যাহাকে 'রুহানী সত্তার' জন্য এক আত্মা বিশেষ বলা উচিত, উহা তাহাদের হৃদয়ে পতিত হয় এবং তাহাদিগকে এক নবতর জীবন দান করে। সেই রূহ বা আত্মা তাহাদের সমগ্র রূহানী সত্তাকে জ্যোতি ও জীবন দান করে। তখন তাহারা কোনরূপ বানোয়াট ও চেষ্টা ব্যতিরেকে অকৃত্রিম ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে খোদাতায়ালার স্মরণে নিয়োজিত থাকে বরং খোদাতায়ালা তাহাদের রূহানী জীবনকে—যাহা তাহারা অত্যন্ত ভালবাসিয়া থাকে—স্বীয় ইয়াদের পাথেয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেন। ইহাকেই অন্য কথায় নামায বলা হয়।'

(যামীমা বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৫৪)

অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

আল্লাহ্ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্নিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)

"আর্নিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দূর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্নিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্নিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক :—এইচ, পি, বি, ল্যাবর‍্যাটরীজ

পরিবেশক :—হোমিও প্রচার ভবন,

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা।

১, আবদুল গণি রোড,

জি, পি, ও বক্স নং ৯০৯, ঢাকা—২ ফোন : ২৫৯০২৪

জুম্‌য়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[২৮শ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ইং মসজিদে আহমদীয়া, মার্টিন রোড, করাচীতে প্রদত্ত]

'আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী হওয়ার জন্য জরুরী, পাপ ও অনাচারের মোকাবেলা যেন সদা উৎকৃষ্টতম কথা ও সর্বোত্তম আমলের দ্বারা করা হয়।

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ইহাই ছিল ইস্‌লাহ ও সংস্কার পদ্ধতি যদ্দারা প্রাণের শত্রুও জীবন উৎসর্গকারী বন্ধুতে পরিণত হইয়া থাকে।

কিন্তু এই পথে কথা ও কার্যের ধারায় ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা পেশ করা অবশ্য জরুরী। ধৈর্য মানব হৃদয়ের অভ্যন্তর পথে সংগোপনে সকল বিরোধিতা গ্রাস করিয়া ফেলে।

ধৈর্যের দ্বারা যে মহান শক্তির উদ্ভব ঘটে তাহা হইল দোওয়ার শক্তি, এবং দোওয়ার ফলশ্রুতিতেই বিপ্লব সংঘটিত হয়।

ভয়াবহ ধ্বংসলীলা দ্রুতবেগে দুনিয়ার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আপনারা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী হইয়া জগতকে ঐ সকল ধ্বংসের কবল হইতে বাঁচাইবার উপায় বিধান করুন।

ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ٥ ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم ٥ وما يلقها الا الذين صبروا وما يلقها الا ذو حظ عظيم ٥ (حم السجدة ايت ٣٣ ٣٤)

[পূর্ব প্রকাশিতের পর—]

মোট কথা, فاذا الذي بينك وبينه عداوة—ইহার অর্থ এ নয় যে, যেমনি মুখ দিয়া তোমরা কথা (উপদেশমূলক) বাহির করিলে, আর ওমনি তাহারা (উহা শ্রবণ করা মাত্র) তোমাদের বন্ধু হইয়া গেল। কেননা সব্‌র বা ধৈর্যের সহিত এমন আকস্মিক কাণ্ডের কোন সম্পর্ক বা মিল নাই অর্থাৎ এদিকে তোমরা কাজ আরম্ভ করিলে আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ দিকে ফলোদয় হইল—ধৈর্যের সহিত এরূপ আকস্মিক কাণ্ডের কি সম্পর্ক থাকিতে পারে ?! সুতরাং কুরআন করীম উহার পরে পরেই বলিয়াছে : وما يلقها الا الذين صبروا

(—'ধৈর্যশীলগণ ব্যতীত আর কেহ উক্ত সুফল লাভ করিতে পারে না')। তবে ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আকস্মিকতার অর্থ কি দাঁড়ায়? এবং ধৈর্যশীলতার বিষয়টি বা কি?—এখন ইহা আমি খুলিয়া বলিব। তবেই বিষয়টি উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ব্যাপার হইল এই যে, প্রতিটি উপদেশের পথ ধৈর্য-পরীক্ষা মূলক পথ হইয়া থাকে। যখন কোন ব্যক্তি কাহাকেও আহ্বান জানায় তখন উহার জন্য দুইটি পদ্ধতি রহিয়াছে। হয়ত ঐ ব্যক্তির সহিত তাহার বন্ধুত্ব আছে, নয়ত শত্রুতা। যদি বন্ধুত্ব থাকে, তাহা হইলে উপদেশ দেওয়ার ফলে বন্ধুত্বও ছুটিয়া যায়। আপনি আপনার বন্ধুদের বার বার উপদেশ দান করিয়া দেখুন—অল্পক্ষণ পরেই তাহারা বলিতে আরম্ভ করিবে, 'কি শুরু করিলে তুমি? তোমার উপদেশের জ্বালায় তো কান ঝালা পালা করিতেছে। দোস্ত! ছাড় এসব কথা।' তারপর যখন আপনি আরও কড়াকড়ি করিবেন, তখন তাহারা বলিবে, 'বন্ধ কর তোমার এসব কথা। কি রব তুলিয়াছ তুমি?' তারপর বলিবে, :'যাও জাহান্নামে। আমাদের দ্বীন পৃথক, তোমার দ্বীন পৃথক। আমাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব। তুমি কে আমাদিকে উপদেশদানকারী?"

সুতরাং অভিজ্ঞতা করিয়া দেখিয়া লউন। এইরূপে বাহ্যতঃ বিপরীত ফল দেখা দেয় অর্থাৎ আপনি যতই উপদেশ দান করিবেন ততই শত্রুতা বাড়িবে। আর নবীদের জামানায় তো ইহা অত্যন্ত ভীষণ আকার ধারন করিয়া থাকে। কেননা বন্ধুত্ব সত্বেও তখন উপদেশের বিষয়বস্তু অনেক উচ্চ ও মহান হইয়া থাকে এবং সেই বিষয়ের দিকে আহ্বান জানানো হয় যাহা জাতির গড্ডলিকা প্রবাহ বা প্রচলিত ধারা হইতে এত ভিন্ন প্রকৃতির হইয়া থাকে যে, উহাদের মধ্যকার ব্যবধান বশতঃও অতি তীব্র ঘৃণা ও দ্বেষের উদ্ভব ঘটে।

অতএব দেখুন, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সব চাইতে বেশী প্রেমের বাণী লইয়া আসিয়া ছিলেন। সর্বাপেক্ষা 'উত্তম কথা' তিনি বলেন এবং 'উৎকৃষ্টতম আমল' তাঁহার ছিল। ইহা সত্বেও সর্বাপেক্ষা অধিক বিরোধিতা করা হয় তাঁহারই। তবে فاذا الذى بينك و بينه عداوة كانه ولى حميم (—যে ব্যক্তি এবং তোমার মধ্যে শত্রুতা বিরাজমান, সহসা সেই তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়া যাইবে—অনুবাদক)— আয়াতের কি অর্থ দাঁড়াইল? বস্তুতঃ সব্‌র তথা ধৈর্য এ বিষয়টিকে পরিষ্কার ভাবে খুলিয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন, শুরুতে এরূপ ঘটিবে। যখন তোমরা নেক কার্যের দিকে আহ্বান করিতে শুরু করিবে, তখন সূচনায় জাতির প্রতিক্রিয়া এইরূপই হইবে। তোমাদের মহব্বতের জবাবে তীব্র ঘৃণার উদ্রেক হইবে কিন্তু তোমরা যদি বিচলিত না হও, তোমরা যদি নিজেদের মহব্বত ও ভালবাসায় অবিচল থাক, তোমরা যদি নিজেদের কথা ও কাজের নিখুঁত সৌন্দর্য বজায় রাখ, তাহা হইলে এই সব্‌র তথা ধৈর্যের ফলশ্রুতিতে 'ইযাল্লাযি' (—'সহসা যে ব্যক্তি……) সম্বলিত ঘটনা প্রকাশমান হইবে। আর যখন ঐরূপ ঘটিবে তখন তোমার এমনই মনে হইবে যেন উহা অকস্মাৎ ঘটিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ সব্‌র তথা ধৈর্য ও সহনশীলতা ভিতরে ভিতরেই অদৃশ্য পথে সকল বিরোধিতা গ্রাস করিয়া ফেলে। সহনশীলতায় বিরাট শক্তি নিহিত আছে। ধৈর্যশীলদের

দোওয়া এবং প্রচেষ্টা যখন ফলপ্রসূ হইতে আরম্ভ করে, তখন এরূপ মনে হয় যেন সহসা ফল ধরিয়াছে—এই আশ্চর্যকর বিষয়ের উপলব্ধিটি অভিব্যক্ত করার উদ্দেশ্যেই কুরআন করীম বলিয়াছে : فاذا الذى بينك وبينه عداوة

"ইযাল্লাযি....." সম্পর্কিত আর একটি বিষয় আছে। 'ইযাল্লাযি'—বাক্যটি আকস্মিকক্রিয়া ব্যতীত একটি অসাধারণ ঘোষণার প্রশংসা ও মাহাত্ম্য প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, দেখ, অচিরেই কত মহান বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটিয়া যাইবে!' অতএব দ্বিতীয় অর্থ হইল এই যে, 'দেখ, কত মহান সুফল উদিত হইল। আমরা যে 'এটা কর বা ঐটা কর' বলিতাম তাহা এমনিই বলি নাই উহা ছিল আশ্চার্যজনক বিপ্লব সৃষ্টিকারী বিষয়বস্তু। সুতরাং দেখ, তোমাদের রক্তপিপাসু শত্রুরাই আত্মোৎসর্গকারী বন্ধু হইয়া গেল।' আমি এখন সব্‌র বা সহনশীলতার বিষয়ে কয়েকটি কথা বর্ণনা করিতে চাই! প্রথম কথাটি তো এই যে, সব্‌র উভয়ক্ষেত্রে চাই—কথায়ও এবং কার্যেও। যাহা বলিবার বিষয়, তাহা (মানুষকে সদা) বলিয়া যাইতে হইবে। এই হইল বলার ধৈর্য, এবং যাহা সুকর্ম তাহা হইতে পিছনে হাটিতে পারিবে না। পরীক্ষা যত ইচ্ছা কঠোরতর হইতে থাকুক না কেন, তোমরা কখনও তোমাদের আমলের সৌন্দর্যকে পাপ ও কদর্যে পরিবর্তিত হইতে দিওনা। এই দুই প্রকারের সব্‌র তোমাদের এখতেয়ার করিতে হইবে, যেমন ইতিপূর্বে আমি বর্ণনা করিয়াছি। শুধু কয়েকটি ইঙ্গিত দান করিয়া সামনে অগ্রসর হইতেছি। এই বিষয়বস্তুটিকে আপনারা বিশ্লেষণ করিলে অনেক কাজের কথা এবং অত্যন্ত হিকমতপূর্ণ কথা আপনাদের হস্তগত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ সহণশীলতার বিষয় নির্দেশ করে এই যে, তোমরা তো মহব্বত প্রদর্শন করিতে থাকিবে কিন্তু তাহারা দুঃখ দিতে থাকিবে। আর এই দুঃখদানের ফলশ্রুতিতে তোমাদের মধ্যে এমন কোন শক্তির সঞ্চার হওয়া উচিত, যদ্বারা তোমরা সেই বিজয় লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিবে যে বিজয়ের আহ্বান তোমাদের জানানো হইতেছে অথবা যাহার ওয়াদা তোমাদের সহিত করা হইতেছে।

ধৈর্য ও সহণশীলতা কোন্ শক্তিটিতে রূপান্তরিত হয়—ইহাই হইল আসল প্রশ্ন। যদি সব্‌র সত্যিকারের হয় এবং সেই ব্যক্তি তাহার দাবীতে সত্য হয় যে সে তাহার নফস বা স্বার্থের খাতিরে কাহারও কল্যাণ করিতেছে না বরং অন্যের মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই করিতেছে এবং যে ব্যক্তির জন্য সে কাজ করিতেছে, তাহার সহিত যদি দয়া, স্নেহ, সহানুভূতি ও প্রীতির প্রকৃত সম্পর্ক থাকে, তাহা হইলে অপর ব্যক্তি যখন অস্বীকৃতি জানায়, তখন ধৈর্য ও সহণশীলতা সর্বদা তাহার জন্য দোওয়ায় পরিবর্তিত হইয়া যায়। মা যখন সন্তানকে উপদেশ করেন, কিন্তু সন্তান জিদ করে এবং কথা মানে না, তখন কোন অজ্ঞ মা-ই হইতে পারে যে তাহাকে অভিসম্পাত করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। অন্যথা, আমরা তো ইহাই দেখিয়াছি যে, মায়েরা তখন কাঁদেন, নিজের মনকে কষ্ট দিতে থাকেন, রাত্রিতে উঠিয়া উঠিয়া দোওয়া করেন এবং অপরাপর লোকদিগকেও দোওয়ার জন্য চিঠি লেখেন যে 'আমার বাচ্চা নষ্ট হইয়া যাইতেছে, দোওয়া করুন যেন নেক হইয়া যায়।'

সুতরাং ধৈর্যের দ্বারা যে বিরাট শক্তির উদ্ভব ঘটে তাহা হইল দোওয়ার পক্তি। আল্লাহতায়ালা বলেন, তোমরা শুধু নিজেদের কথার এবং নিজেদের নেক আমলের উপরই নির্ভর করিও না। যখন এই সব বিষয়ে অবিচল থাকিয়া সব্‌র করিবে এবং তোমাদিগকে দুঃখ-কষ্ট দেওয়া হইবে তখন সেই সব্‌র অবশ্যই দোওয়ায় পরিবর্তিত হইবে। তারপর সেই দোওয়া মহান সুফলের উদয় ঘটাইবে। সুতরাং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) যে ফরমাইয়াছেন যে "আরবের জনহীন বিয়াবানে যে এক আশ্চর্যকর ঘটনা ঘটিয়া গেল—শতাব্দীর পর শতাব্দী কাল ব্যাপী মৃত ব্যক্তিরা যে জীবিত হইয়া উঠিল এবং বংশানুক্রমে বিকৃত লোকগুলি যে ইলাহী রং পরিগ্রহ করিল, তোমরা কি জান সেই ব্যাপারটি (-এর রহস্য) কি ছিল ?—উহা একজন 'ফানি ফি-ল্লাহ' (—আল্লাহ্‌তে আত্মবিলীন) ব্যক্তির দোওয়াই তো ছিল।" ঐরূপ দোওয়া সব্‌র ও সহণশীলতার ফলশ্রুতিতেই উদ্ভাবিত হইয়া থাকে।

বেসবুর (ধৈর্যহীন) ব্যক্তি তো তাহার হৃদয়ের ব্যথা-বেদনা ক্রোধ-উত্তেজনার বহিপ্রকাশের দ্বারা নিষ্কাসন করিয়া দেয়। তাহার অশ্রু নির্গত হইবে কোথা হইতে ? যে ব্যক্তি গাল-মন্দের মাধ্যমে জবাব দিয়া নিজের হৃদয়কে ঠাণ্ডা করিয়া বসিয়াছে, অথবা সামনে কথা বলিতে ভয় পাইয়া থাকিলে পিছনে গৃহে আসিয়া অজস্রবার বক্‌বক্‌ করিয়াছে যে, 'অমুকে এই বকিল বা এই করিল আর সেই করিল,' সে বেচারা কি করিয়া রাত্রিতে উঠিয়া কাঁদিবার তওফিক পাইতে পারে ? কিন্তু যখন সে দেখে এবং বুঝে যে শুধু খোদাতায়ালার খাতিরেই তাহাকে নির্যাতন করা হইয়াছে, তারপরও সে নিরব থাকে এবং নিবিষ্টচিত্তে সে তাহার সমস্ত মনোযোগকে তাহার রব্বের দিকে নিবদ্ধ করিয়া বলিতে থাকে, 'হে আল্লাহ্‌ ! আমি তোমার উদ্দেশ্যে নির্যাতিত, নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হইয়াছি, কিন্তু আমি ঐ সবকিছু সহ্য করিয়া সব্‌র করিলাম।' এরূপ ব্যক্তির হৃদয় তখন এমনভাবে বিগলিত হইতে শুরু করে যে, তারপর যখন সে রাত্রিতে উঠিয়া আল্লাহর দরবারে দণ্ডায়মান হয় তখন তাহার অশ্রু স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবাহিত হয়। এমতাবস্থায়—"ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাসতাইন"—এর ধ্বনি এরূপ ব্যথা ও বেদনার সহিত উত্থিত হয় যে উহা আল্লাহর দরবারে গৃহীত না হইয়া পারে না।

সুতরাং সব্‌র ও সহণশীলতার সহিত তবলীগের গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে, এবং সবরও এরূপ হইতে হইবে যাহা দোওয়াতে প্রতিফলিত হয় তথা দরদভরা দোওয়ায় পরিণত হয়। তখন আল্লাহতায়ালা বলেন : "ফা ইযাল্লাযি বাইনাকা ও বাইনাহু আদাওয়াতুন....."—তুমি এরূপ অনুভব করিবে যেন অকস্মাৎ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। তুমি হতভম্ব হইয়া পড়িবে যে, এ কি ঘটিয়া গেল !—গতকাল পর্যন্ত যে সকল ব্যক্তি গালি দিতো, আজ তাহাদের এ কি রূপান্তর ঘটিল !!" এই সকল ঘটনা পূর্বেও ঘটিয়াছে, আজও ঘটিতে পারে এবং বস্তুতঃ ঘটিতেছে। কিন্তু ইহাদের উত্তম দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিষয়বস্তুটির সংক্ষেপন করিয়া উপসংহারে কুরআন করীম এমন একটি কথা বলিয়াছে যাহা হইল সকল কথার চুম্বক ও সামগ্রিক কথা এবং সকল উপদেশের কেন্দ্র-বিন্দু ও উৎস স্বরূপ। আল্লাহতায়ালা বলেন :

وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ٥

(—'যাহারা ধৈর্যশীল তাহাদের ছাড়া আর কাহাকেও ইহার শিক্ষা ও তওফিক দান করা হয় না অথবা সে ব্যক্তি ব্যতীত যিনি মহা সৌভাগ্যশালী।")—অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই ধৈর্য ধারণ করিবে সেও এ ফলই পাইবে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে "যু-হায্‌যিন আযীম" (মহা সৌভাগ্যশালী) যেরূপ সুফল লাভ করিয়াছেন সেরূপ সুফল কেহ লাভ করিতে পারে না। সে 'মহা সৌভাগ্যশালী' কে? তিনি হইলেন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। কেননা তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক ধৈর্যের নমুনা প্রদর্শন করেন। 'যু-হায্‌যিন আযীম' সে ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি ধৈর্যশীলতার গুণে বৃহত্তম অংশের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন। সাধারণ ধৈর্যশীলরাও (ইহার অন্তর্ভূক্ত) আছেন বটে, তাহাদিগকেও খোদাতায়ালা সুফল হইতে বঞ্চিত রাখিবেন না। কিন্তু আল্লাহতায়ালা বলেন যে, ধৈর্য বলিতে কি বুঝায়? তবলীগ কিভাবে করিতে হয়? 'দাওয়াত ইলাল্লাহ্' বলিতে কি বুঝায়? 'আমলে-সালেহ' (সৎকর্ম)-এর স্বরূপ কি? পাপকে পুণ্যের সৌন্দর্যে পরিবর্তিত করার বিষয়বস্তুটি কি?—তোমরা তাহা যদি শিখিতে চাও, তাহা হইলে সংক্ষেপতঃ কথা এই যে, "যু-হায্‌যিল আযীম" তথা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দেখিয়া লও। তিনি শুধু সব্‌র বা ধৈর্যগুণে সর্ববৃহদাংশের অধিকারীই নন বরং এ বিষয়ের প্রতিটি শাখায় সর্ববৃহদাংশের অধিকারী। 'দায়ী ইলাল্লাহ' হিসাবেও আল্লাহর দিকে আহ্বানের সর্ববৃহদাংশ তাঁহাকে দান করা হইয়াছে. আমলে-সালেহর দিক দিয়াও হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-ই সর্ববৃহদাংশের অধিকারী প্রতীয়মান হন, 'ইদফা বিল্লাতি হিয়া আহসান'-এর মজমুনের দিক দিয়াও হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) 'যু-হাযযিন আযীম' সপ্রমাণিত হন এবং সেই সুফল লাভের অর্থাৎ সহসা শত্রুদের মিত্র ও আত্মোৎসর্গকারী বন্ধুরূপে পরিবর্তিত হওয়ার দিক দিয়াও তিনি চরম ও পরম সৌভাগ্যের অধিকারী সাব্যস্ত হন এবং সহণশীলতার উচ্চতম প্রকাশের দিক দিয়াও তিনি 'যু-হায্‌যিন আযীম' প্রতিপন্ন হন।

সুতরাং হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র সীরাত (জীবনাদর্শ) তবলীগের যে পদ্ধতির শিক্ষাদান ক'রে উহার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া কথার ইতি টানা হইয়াছে। কথিত হয়:

ذ ه ے نامه کو اتنا طول غالب مختصر لکھ دے

(—'হে গালিব, তুমি তোমার পত্রটিকে এত লম্বা করিও না; সংক্ষেপে লিখিয়া দাও।') এখানেও অনুরূপ বিষয়বস্তু। যেমন কবি বিরক্ত হইয়া বলেন, 'চল, আমি কথা শেষ করি, একটি বাক্যেই সকল কথা বলে ফেলি'—তেমনি কুরআন করীম মনমুগ্ধকর ভঙ্গীমায় একটি শব্দতেই সকল কথার সমাপ্তি ঘটাইয়াছে—"যু-হায্‌যিল আযীম" উচ্চারণ করিয়া সমগ্র ব্যাপারটি পরিস্কার ও উজ্জল করিয়া দিয়াছে।

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিয়ম বা পদ্ধতি ছিল এই যে, সর্বদা তবলীগের ফলশ্রুতিতে যখনই তাঁহাকে দুঃখ-যাতনা দেওয়া হইয়াছে, তখন তিনি না তো তবলীগ হইতে বিরত হইয়াছেন, না তো যাতনাকারীদিগকে বদ-দোওয়া দিয়াছেন, আর না তাহাদের নিকট ভীত হইয়াছেন, না কোন পর্যায়েও নিজের পয়গাম (মানুষের নিকট) পৌঁছাইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন। ইহা সত্বেও যে, সোসাইটি (সমাজ) তাঁহাকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তিনি সোসাইটির মধ্যে সৌন্দর্য রূপায়ন করিয়া গিয়াছেন। এবং এই কর্ম-প্রচেষ্টা অব্যাহতগতিতে জারী থাকে এমন কি তাঁহার সহিত আরও ধৈর্য-শীলরা আসিয়া শামিল হয় এবং আরও কষ্ট সহিষ্ণু ব্যক্তিদের পাওয়া যাইতে থাকে। আর দুঃখ-যাতনা সহ্যকারীদের এই কাফিলা ক্রমঅগ্রসরমান হইয়া চলিয়া যায়, এমন কি সেই বিপ্লব উপস্থিত হয় যাহার সম্বন্ধে আল্লাহ বলিয়াছেন যে, 'তোমরা এখানে বসিয়া আজ যখন পিছনে ইতিহাসের দিকে তাকাইয়া দেখ তখন তোমরা মনে কর যে উহা অকস্মাৎ ঘটিয়া গিয়াছিল। বস্তুতঃ আকস্মিকভাবে ঘটে নাই। উহার পশ্চাতে তো অনেক রক্ত ঝরিয়াছিল,—বাসনা ও কামনার রক্ত, ভাবানুভূতির রক্ত। নিজেদের প্রিয়জনের রক্ত দিতেও কোন কুণ্ঠা বোধ করা হয় নাই। নিজেদের সকল প্রকার আশা-আকাঙ্খা সেই মহান ও উচ্চাঙ্গীণ উদ্দেশ্যাবলীর পথে উৎসর্গিত করা হইয়াছে। উক্ত সবর ও ধৈর্যের পরিসর যখন প্রসারিত ও বিলম্বিত হয়, তখন আল্লাহতায়ালার কুদরত ও পরাক্রম সেই ফলোদয় ঘটায় যাহার সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন: "ওয়া ইযাল্লাযি বাইনাকা ওয়া বাইনাহু আদাওয়াতুন কায়ান্নাহু ওয়ালিউন হামীম।"

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জামানায় এই মহান বিপ্লব যে শান ও মর্যাদা সহকারে প্রকাশিত হয় তাহা অন্য কোন নবীর ইতিহাসে উহার সহস্রতম অংশও আপনারা দেখিতে পাইবেন না। বিস্ময়কর বিপ্লব মালা!! ঘোরতম শত্রুগণ মহান বন্ধু-রূপে পরিবর্তিত হইয়া যাওয়ার এত বিপুল সংখ্যক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে যে, মানুষ হতবাক হইয়া যায়। মুজাহেদীনের বৃত্তান্ত ইতিহাসে পাঠ করিয়া মানুষ আজও প্রশংসামুখর হইয়া উঠে এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে অভিভূত হইয়া পড়ে।

একবার তিনজন মুজাহেদ জখম হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাদের জিহ্বা শুষ্ক হইয়া পড়ে-তেছিল, প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সেখানে পানি ছিল না। ইকরামা (রাঃ) তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি যখন পানি লইয়া তাঁহার নিকট পৌঁছিল তখন তাঁহার নিকটবর্তী আর একজন আহতের উপর তাঁহার দৃষ্টি গিয়া পড়িল। ইকরামা ইশারা করিয়া বলিলেন, 'প্রথমে তাঁহাকে পানি পান করাও, তারপর আমার নিকট আসিও।" পানি বহণকারী ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট পৌঁছিলে সে ব্যক্তির দৃষ্টি পার্শ্ববর্তী আর একজন আহতের উপর পড়িল। সুতরাং তিনিও একই ইশারা করিয়া বলিলেন, 'প্রথমে তাঁহাকে পানি পান করাও, তারপর আমার নিকট নিকট আসিও।" কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, তাঁহারা

তিনজন ছিলেন, আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন যে আরও বেশী ছিলেন। কিন্তু যত জনই হইয়া থাকুন, ইহা বাস্তব সত্য যে, তিনিও যখন অস্বীকার করিলেন—"না, প্রথমে অন্যকে পান করাও" তখন সে ইকরামার নিকট ফিরিয়া গেল, কিন্তু তার পূর্বেই ইকরামাও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন. দ্বিতীয় ব্যক্তিও মারা গিয়াছিলেন এবং তৃতীয় জনও আর বাঁচিয়া ছিলেন না। যে সকল লোকের মধ্যে একে অন্যের উদ্দেশ্যে প্রাণ উৎসর্গ করিবার এবং অপরের দুঃখ-কষ্ট ও প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দানের বিস্ময়কর নমুনা ও দৃষ্টান্তসমূহ প্রকাশিত হয়—ইহারা ঐ সকল লোকই ছিলেন যাহারা পূর্বে মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা প্রাণের শত্রু ছিলেন। ইকরামা সেই ব্যক্তি ছিলেন যিনি উহোদের যুদ্ধের রক্তপাতে সব চাইতে বেশী অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অবশিষ্ট সাথীগণও ঐ সকল নও-মুস্লিম ছিলেন যাহারা মুসলমানদিগের প্রভূত ক্ষতি সাধণ করিয়াছিলেন। তারপর তাঁহাদের আমূল পরিবর্তন ঘটিলে এখন তাঁহাদের অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এই যে তাহাদের প্রাণ যাইতেছে, পিপাসায় জিহ্বা শুকাইতেছে—যখন আহত ব্যক্তি প্রখর তাপে এক চুমুক পানির জন্য লালায়িত হইয়া থাকে—সেই করুণ অবস্থায়—আরএক জন মুসলমান ভাই তাহার চাইতেও বেশী পিপাসায় কাতর ভাবিয়া নিজে পানি পান না করা বরং অন্যকে সুযোগ করিয়া দেওয়া —ইহা কোন সাধারণ ও সামান্য কুরবানী নয়। সাধারণ পিপাসার সময়েও যখন পানি নিজের কাছে আসে তখন—আপনি কোন দিন চিন্তা করিয়া দেখুন—কিরূপ মনে চায়, যেন হাত বাড়াইয়া পানি প্রথমে নিজে পান করেন. অপরের পিপাসা নিবারণের ব্যাপার পরে দেখা যাইবে। কিন্তু মারাত্মক ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় আরবের তপ্ত মরুপ্রান্তরে ঐরূপ ঘটনা ঘটিয়া যাওয়া—ইহা কোন সাধারণ ব্যাপার নয় কিন্তু এই ধরণের বিপুল সংখ্যক ঘটনা ঘটিয়াছে সমষ্টিগতরূপেও এবং ব্যক্তিগত ভাবেও।

সুমামা বিন এসাল বনুহানিফা গোত্রের ব্যক্তি ছিলেন এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলেহী ওয়া সাল্লামের ঘোর শত্রু ছিলেন। যখনই সুযোগ ঘটিত, মুসলমানদিগকে হত্যা ও লুণ্ঠন করিতেন। তিনি একবার মুসলমানদের হাতে গ্রেপ্তার হইলেন। তাহাকে আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহু :)-এর সমীপে পেশ করা হইলে তিনি তাহাকে মসজিদে-নববীর স্তম্ভের সহিত বাঁধিয়া রাখার আদেশ দিলেন। তারপর আঁ-হুজুর (সাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন. "সুমামা! বল, তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা যায়?" সে বলিল, "যদি হত্যা করার আদেশ দেন তাহা হইলে উহা হইবে একজন হন্তা ও খুনী ব্যক্তিকেই হত্যা করার আদেশ। আর যদি আপনি ক্ষমা করিয়া দেন, তাহা হইলে উহা হইবে একজন এহসানকারী সুলভ আপনার সদ্ব্যবহার। আর যদি ফিদিয়া (মুক্তিপণ) চান, (ধনী ব্যক্তি ছিল সে) তাহা হইলে আপনি যে পরিমাণ ফিদিয়া গ্রহণ করিতে চান তাহা আমি পরিশোধ করিতে প্রস্তুত।' রসুল করীম (সাল্লাল্লাহুঃ) কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া যান। পরের দিনও একই রকম ঘটনা ঘটিল। তৃতীয় দিনও তদ্রূপই ঘটিল। তারপর হুজুর (সাঃ) বলিলেন, 'তাহার বাঁধন খুলিয়া দাও।'

আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর ঐ আদেশটিতে উহার গভীরে নামিয়া যদি আপনারা দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে 'হুসনে আমল' অর্থাৎ ব্যবহারিক সৌন্দর্যের এক অতি মনোরম চিত্র দেখিতে পাইবেন। বাঁধন খুলিয়া দিলে প্রথমে সুমামা বাহিরে চলিয়া গেলেন, তারপর গুসল করিলেন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তারপর কলেমা পাঠ করিয়া মসজিদে প্রবেশ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "ইয়া রাসুলুল্লাহ! ইতিপূর্বে আপনি আমার দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা অভিশপ্ত ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু আজ হইতে আপনার চাইতে প্রিয়তর মানুষ আমার নিকট আর কেহ নয়। আজিকার পূর্বে আপনার ধর্মের প্রতি আমি ভীষণ ঘৃণা পোষণ করিতাম কিন্তু, আজ হইতে উহার চাইতে উৎকৃষ্টতর দ্বীন অন্য কোনটিও দেখিতে পাই না। এবং হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার এই শহরটি আমার নিকট সর্বাপেক্ষা তুচ্ছ এবং লাঞ্ছিত বলিয়া প্রতীয়মান হইত কিন্তু আজ ইহা আমার চক্ষের তারকায় পরিণত হইয়াছে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় শহর বলিয়া ইহাই মনে হয়।"

সুতরাং "ফা ইযাল্লাযি বাইনাকা ওয়া বাইনাহু আদাওয়াতুন কায়ান্নাহু ওয়ালিউন হামীম"—সম্পর্কিত এই ঘটনাটির পিছনে আর একটি হিকমাত নিহিত আছে। কোন ব্যক্তি যে ফয়সালা করিয়াছে যে সে পুণ্য ও সৎব্যবহারের জলওয়া প্রদর্শন করিবে, এবং তাহা দেখিয়া সারা জগৎ প্রশংসামুখর হইয়া উঠিবে যদিও তাহার পুণ্য ও সদব্যবহার কত অসংলগ্ন এবং স্থান-কাল-পাত্র ভেদের ক্ষেত্রে কত অনুপোযোগী হউক না কেন—আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঐরূপ মানুষ ছিলেন না। তিনি 'হুসনে-আমল'—কর্মে নিখুঁত সৌন্দর্যের একনিষ্ঠ পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি স্থান, কাল ও পাত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। যেখানে ক্ষমায় শীঘ্র উপকার হইতো, সেখানে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করিয়া দিতেন। যেখানে সময় দরকার হইতো, সেখানে অপেক্ষা করিতেন। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সামামের উল্লিখিত ফয়সালাটিতে এই হিকমাত পরিদৃষ্ট হয় যে, মসজিদে-নব্বীতে পাঁচ-ওয়াক্ত নামাজ হইতেছিল এবং সুমামাকে একটি স্তম্ভের সহিত বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। এমতাবস্থায় তাহাকে যেহেতু তবলীগ করার সময় বা সুযোগ ছিল না, সেজন্য আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর মোবারক উদ্দেশ্য এই ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে "সে যেন তিন দিন আমাদের সাহচর্যে থাকিয়া যায়, তারপর আমরা দেখিব, তাহার অন্তর কিরূপে (সত্যের শিকারে পরিণত হইতে) বাঁচিয়া যায়।" মোট কথা, সে নিরবে লক্ষ্য করে যে, 'ইহারা কিরূপ লোক? ইহারা কি করে? দিনের বেলায়ও মসজিদ আবাদ হইতে থাকে এবং রাত্রিতেও অশ্রুজলে সিক্ত করা হয়। ইহারা তো অদ্ভুদ ধরণের খোদার বান্দা!" সুতরাং যখন সে মুসলমানদের (আচরণের) সুপ্রভাবে অভিভূত হইল এবং মানসিকভাবে সত্য গ্রহণে প্রস্তুত হইল, তখন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাহাকে মুক্তি দানের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি বলিলেন, "তাহার বাঁধন খুলিয়া দাও। এখন সে কোথায়ও যাইতে পারে না।" ইহার অর্থ ছিল এই যে, 'সে এখন ইসলামের সৌন্দর্যে এতই মগ্ন হইয়াছে যে এখন তাহার এই বাঁধন যদি খুলিয়াও দাও, তবুও সে পুনরায় দাস হইয়া আসিবে।' অতএব, তদ্রুপই ঘটিল।

সুতরাং আমলের উৎকৃষ্টতার ক্ষেত্রে হিকমাত ও প্রজ্ঞাও অত্যাবশ্যক। হিকমাতের সহিত এমনভাবে কার্য সম্পাদন করুন, যেন শুধু বাহ্যতঃই উহা ভাল না দেখায় বরং উহাতে যেন সৌন্দর্যের গভীরতাও বিরাজ করে। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কখনও কোন হিকমাত বিসর্জন দিয়া কোন ফয়সালা করিতেন না। প্রতিটি ফয়সালার পিছনে হিকমাত সক্রিয় থাকিত। তাঁহার প্রতিটি ফয়সালা অত্যন্ত গভীর এবং হিকমাত ও প্রজ্ঞার সাগর বা উৎস রূপে দৃশ্যমান হয়। আপনি (তাঁহার পবিত্র জীবনের) যে কোন ঘটনায় স্থিরচিত্তে চিন্তা করুন এবং উহার মধ্যে ডুবিয়া দেখুন, আপনি মনি-মুক্তা পাইয়া যাইবেন। আপনি তালাশ করুন, আঁ-হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইয়ে ওয়া সাল্লামের জীবনে এমন কোন একটি ঘটনাও নাই, যাহার গভীরে হিকমাতের খনি লুক্কায়িত নয়।

মোট কথা, ইহাই হইল তবলীগের সেই পদ্ধতি যাহা কুরআন করীম শিক্ষা দিয়াছে এবং এই হইল সেই সকল সুফল যেগুলি কুরআন করীমের বর্ণনানুসারে নিশ্চিতভাবে অবশ্যই প্রতিফলিত হইয়া থাকে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জামানায়ও প্রতিফলিত হইয়াছে। আমরা নিজ চোখে অগণিত বার এ সব সুফল প্রতিফলিত হইতে দেখিয়াছি। এই মাত্র কয়েক সপ্তাহ গত হইল, লাহোরে একত্রে মিলিয়া বসার সুযোগ ঘটিয়াছিল। কোন এক গৃহে দীর্ঘকাল যাবৎ একজন মহিলা বাস করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি আহমদী ছিলেন না। বই-পুস্তক পড়িতেন, তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনাও করিতে থাকেন। এবার যখন আহমদী হইলেন তখন ঐ আয়াত—"ফা ইযাল্লাযি বাইনাকা ওয়া বাইনাহু আদাওয়াতুন···"সম্বলিত জলওয়া আমরা অবলোকন করিলাম। সুতরাং তিনি আহমদী হওয়ার পর কয়েক দিন যাবৎ এজন্য কাঁদিতে থাকেন যে তিনি আহমদী তো হইয়াছেন বটে কিন্তু তিনি যে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে গালি-গালাজ করিতেন সেজন্য তিনি আল্লাহতায়ালার নিকট ক্ষমা পাইবেন কি না—এই কারণে তিনি দুঃখে মোহ্যমান হইয়া পড়েন; অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও অস্থির থাকেন। গৃহবাসী অন্যান্যরা তাঁহাকে সান্ত্বনা দেন, তাঁহার প্রতি প্রীতি ভরা সদ্ব্যবহার করেন। তারপর যাইয়া বড় মুস্কিলে তিনি স্বস্থি লাভ করেন।

সুতরাং ইহা এমন কোন আয়াত নয় যাহা বিগতকালের সহিত সম্বন্ধ রাখে। ইহা তো এক চির সচল জীবন্ত আয়াত। কেননা যে সকল লোকের সহিত ইহার সম্পর্ক ছিল তাহারা নিরবচ্ছিন্ন ধারায় সদ্ব্যবহার প্রদর্শন করিতে থাকেন। তাঁহারা বিরোধিতাও সহ্য করেন, গালি-গালাজও শ্রবণ করেন কিন্তু লেশমাত্রও ভ্রুক্ষেপ করেন নাই। নিজেদের সদ্ব্যবহার প্রদর্শনে সামান্যতমও কুণ্ঠিত হন নাই এবং খোদাতায়ালা যেমন বলিয়াছেন, সব্‌র তথা ধৈর্য ও সহনশীলতায় বৃক্ষে সদা মিষ্ট ফল ধরে—সেই সব মিষ্ট ফল আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অর্থাৎ কঠোর বিরুদ্ধবাদীগণও সহসা আত্মোৎসর্গকারী বন্ধুরূপে পরিণত হইয়াছেন।

মোট কথা, এই পদ্ধতিতে যদি আপনারা 'দায়ী ইলাল্লাহ্'-য় পরিণত হন, তাহা হইলে আল্লাহতায়ালার ফজলে প্রতিটি গৃহে ইনশাআল্লাহ্ এক বিপ্লব ঘটিতে শুরু করিবে।

প্রত্যেক 'দায়ী-ইলাল্লাহ্'-কে আল্লাহ্তায়ালা সুমিষ্ট ফল দান করিবেন। সেজন্য সব্র তথা ধৈর্য ধারণ করুন এবং দোওয়া করিতে থাকুন; খোদাতায়ালার পথে দুঃখ-কষ্ট সহিয়াও সন্তুষ্ট থাকুন। নিজেদের অভিযোগ মানুষের নিকট পেশ করিবেন না, বরং খোদাতায়ালা সমীপে পেশ করুন; তিনি যথেষ্ট—"নে'মাল মওলা ওয়া নে'মাল ওয়াকীল"—তিনি অপেক্ষা আর কোন 'মওলা' নাই,(—আর কেহ উত্তম বন্ধু ও প্রভু নাই)। তাঁহার সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষণ যদি আপনাদের হাসিল হইয়া যায়, তাহা হইলে আর কোন সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষণের প্রয়োজন থাকে না। আবার তিনি আপনাদের উত্তম 'ওয়াকীল' (কার্য নির্বাহক)। আপনাদের সকল প্রকার ঝগড়া-বিবাদ ও ঝামেলার নিষ্পত্তি তিনি তাঁহার ফজল ও করমে করিয়া দিবেন। তিনিই সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য—তওক্কল ও ভরসার উপযুক্ত।

আল্লাহতায়ালার ফজল ও তওফিক দানে সমগ্র জামাত যেন কুরআন করীমে যেমন আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন তেমন উত্তম রঙের "দায়ী ইলাল্লাহ' হইয়া যায়। কেননা জামানার মতি-গতি বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে; ভয়াবহ ধ্বংসলীলা মুখ বিস্ফারিত করিয়া দ্রুতবেগে দুনিয়ার দিকে ধাইয়া আসিতেছে। এই সময়টি যদি অতিবাহিত হইয়া যায়, তাহা হইলে এই জাতি-গুলি আপনাদের হাত হইতে ছুটিয়া যাইবে। আজ মানস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি কোণের দিক দিয়া ইহা অপেক্ষা উপযুক্ত আর কোন সময় হইতে পারে না, যাহাতে আপনারা তাহাদিগকে সত্যের দিকে আহ্বান করেন এবং তাহাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। অন্যথা, যদি বিশ্বজনীন আন্তর্জাতিক বিপদাবলী আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহা হইলে দুনিয়াকে আমরা হেদায়েত দানের পূর্বেই এমন না হউক যে পাপাচারীদের সঙ্গে নেক পুণ্যবানগণও নিষ্পেষিত হইয়া যান। কেননা কুরআন করীমে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন যে, "সেই আযাবকে ভয় কর যদ্দ্বারা পাপীদের সঙ্গে নেক ব্যক্তিরাও পিষ্ট হয়।" কুরআন শরীফের একটি কামালিয়ত ইহাও যে, যে-কোন ধরণের পরিস্থিতিই হউক—উহার কোন দিকই বর্ণনা করিতে ছাড়ে না, ছোট-বড় কোন বিষয়কেই উপেক্ষা করে না। কখনও কখনও এমন বিরল সময়ও উপস্থিত হয় যখন জাতিবর্গ গাফলত ও অযোগ্যতা বশতঃ দুনিয়াকে ধ্বংস হইতে দেয়। সে প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেন যে, এরূপ হইলে উহাতে তোমাদেরও অংশ থাকিবে। আযাব বা শাস্তি তো তাহাদিগকে দেওয়া হইবে, কিন্তু আটার সহিত ঘুনও পিষা যায়—এখানে অবশ্য ফরমাইতেছেন যে ঘুণের সঙ্গে আটা পিষ্ট হইবে, কেননা সংখ্যাগরিষ্ঠ তো হইল ঘুনেরা।

সুতরাং এরূপ ভয়াবহ সময় হইতে বাঁচিবার জন্যও জরুরী, আপনারা যেন নিজেদের তবলীগের কাজকে সতেজ করেন। আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে ইহার তওফিক দান করুন। আপনাদিগকে সাহস দিন, সব্র ও ধৈর্য দান করুন, দোওয়া করার তওফিক দিন, তাঁহার নির্দশনাবলীর সহিত তিনি আপনাদের জন্য দিবালোকেও প্রকাশিত হউন এবং রাত্রিকালেও; আপ-নারা যেন উপলব্ধি করিতে পারেন যে, আমাদের একজন জিন্দা খোদা আছেন। একজন শক্তিশালী অস্তিত্বের ছত্রছায়ায় অগ্রসর হইতে মানুষ ভয় পায় না, বরং নির্ভিক হয়। প্রবাদে

বলা হয়, "স্ব গৃহে বিড়ালও বাঘ হইয়া থাকে।" আপনাদের মোকাম ও মর্যাদা তো তাহার চাইতে বহু উর্ধে। খোদাতায়ালার হেফাজত গৃহের হেফাজত অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী এবং মজবুত হেফাজত, যাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। এই মোকাম নিজেদের হৃদয়ে সৃষ্টি করুন। নিজেদের মাহাত্মের অনুভূতি জাগরুক করুন। তারপর দেখুন, কোন 'দায়ী ইলাল্লাহ' কোন বৎসরও ফল হইতে বঞ্চিত থাকে—ইনশাআল্লাহ এমন কখনও হইতেই পারে না। এক, দুই, তিন বা চারটি করিয়া ফল ধরিবেই। আল্লাহতায়ালার ফেরেস্তাগণ যেমন বিভিন্ন পর বা পাখা বিশিষ্ট হইয়া থাকেন, তেমনি "দায়ী-ইলাল্লাহ"-ও বিভিন্ন শক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকেন। কেহ দুই বা চার পাখা বিশিষ্ট হয়, আবার কেহ আট পাখা বিশিষ্ট হয়। আল্লাহতায়ালা বলেন, "যাহাকে ইচ্ছা তিনি তাহা অপেক্ষাও বাড়াইয়া দিতে পারেন।" খোদাতায়ালা আপনাদের শক্তির পাখাসমূহ ক্রমাগত বাড়াইতে থাকুন এবং সদা-সর্বদা তাঁহার ফজলের ছায়াতলে আপনারা ক্রমঅগ্রসরমান হইয়া যাইতে থাকুন। (আমীন)।

(আল-ফজল, ১৫ই মে ১৯৮৩ইং)

অনুবাদ : মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ** সদর মুরুব্বী

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানানো যাইতেছে যে, বিগত ২৭শে জুলাই ১৯৮৩ইং সেলসেলার অবসরপ্রাপ্ত সদর মুরুব্বী মোহ্‌তারম মৌলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেবের স্ত্রী সৈয়দা রাযিয়া বেগম সাহেবা ঢাকায় ইন্তেকাল করেন, "ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন"। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল প্রায় ৫৯ বৎসর। মরহুমা অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী আহমদী, নামাজ-রোজার বড়ই পাবন্দ ও তাহাজ্জুদ গোজার এবং ওসিয়তকারিনী ছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট হিসাবেও তিনি এক সময়ে দীর্ঘকাল যাবৎ খেদমতেরও তওফিক পাইয়াছিলেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত স্বামী, তিন পুত্র ও তিন কন্যা এবং নাতি-নাতনী তিনি রাখিয়া যান। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে তাঁহার খাদানলীতে অস্ত্রপ্রচার করা হইয়াছিল। তাঁহার জানাযার নামায উক্ত তারিখে বাদ জুময়া ঢাকার কেন্দ্রীয় আহমদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম আমীর সাহেব সহ উপস্থিত বিপুল সংখ্যক আহমদী ভ্রাতা শরীক হন। অতঃপর বনানী কবরস্থানে মরহুমাকে সমাহিত করা হয়। আল্লাহ্‌তায়ালা মরহুমার আত্মার মাগফিরাত করুন ও জান্নাতুল ফেরদৌসে উচ্চ স্থান দান করুন এবং শোকসন্তপ্ত স্বামী পুত্র ও কন্যাগণকে এবং অন্যান্য সকল আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্যধারণের তওফিক দিন এবং তাহাদের সকলের হাফেজ ও নাসের হউন।

পবিত্র কুরআন ও বিজ্ঞান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৪)

৪। প্রাকৃতিক বিধান ও আধ্যাত্মিক বিধান

আল্লাহতা'লা বিশ্ব-জগতকে সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছেন উৎকৃষ্টতম উপাদান দিয়ে তাঁরই গুনাবলীর প্রকাশক হিসেবে, তাঁর প্রতিনিধি এবং উপাসনাকারী হিসেবে। মানব জীবনের এই উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার নিমিত্ত আল্লাহতা'লা দু'টি মৌলিক বিধানের ব্যবস্থা করেছেন—(১) প্রাকৃতিক বিধান (Natural law) এবং (২) আধ্যাত্মিক বিধান (Spiritual law)। মানুষ ব্যতিত অন্যান্য সকল প্রাণী এবং বস্তু-জগতের জন্য প্রাকৃতিক বিধানই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে মানুষের জন্য উভয় বিধানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের জন্য পর্যায়ক্রমিক উন্নতি ও অগ্রগতির অফুরন্ত সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে। প্রধানতঃ মানুষের পার্থিব উন্নতির সংগে প্রাকৃতিক বিধানের এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সংগে আধ্যাত্মিক বিধানের সম্পর্ক রয়েছে। এই দু'টি মৌল বিধানের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে আরো দু'টি বিধান—(ক) সামাজিক বিধান এবং (খ) নৈতিক বিধান। বস্তুতঃপক্ষে সামাজিক বিধান রচিত হয় মূলতঃ প্রাকৃতিক বিধানের ভিত্তিতে এবং নৈতিক বিধান তৈরী হয় মূলতঃ আধ্যাত্মিক বিধানের ভিত্তিতে—যদিও একথা সত্য যে, অনেক সামাজিক বিধান তৈরী করতে আধ্যাত্মিক বিধানের সাহায্য নিতে হয় এবং নৈতিক বিধানের জন্য প্রাকৃতিক বিধানের সাহায্য নিতে হয়। প্রাকৃতিক বিধানের ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানের নানা শাখা ও প্রশাখা। সামাজিক বিধানের জন্য গড়ে উঠেছে সমাজ-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ইত্যাদি। আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক বিধানের জন্য যুগে যুগে প্রেরিত হয়েছেন নবী-রসুলগণ, যারা আল্লাহর বাণী প্রচার করেছেন এবং মানুষকে সেই বাণীর আলোক সুপথে পরিচালিত করেছেন।

উপরে বর্ণিত দু'টি মৌল বিধান তথা প্রাকৃতিক বিধান এবং আধ্যাত্মিক বিধানের মূল উৎস হলেন আল্লাহতায়াল—তিনিই এই বিশ্ব-জগতের মহা-নিয়ন্তা এবং মহা-পরিচালক। তিনি মানুষের মঙ্গলের জন্যই উভয় বিধানের ব্যবস্থা করেছেন, যাতে মানুষ দৈহিক প্রয়োজনসমূহ যথাযথভাবে পূর্ণ করতে সক্ষম হয় এবং সেইসঙ্গে অন্যান্য সৃষ্টি হতে উৎকৃষ্টতম হওয়ার কারণে দৈহিক প্রয়োজনের উর্ধে আরোহণ করে আত্মার প্রয়োজনসমূহও পূর্ণ করতে পারে। একই উৎস হতে উদ্ভূত এবং একই উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত বলে উভয় বিধানের মধ্যে কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নেই। বিষয়টি সম্বন্ধে উভয় বিধানের আলোকে গভীর মনোনিবেশসহ পর্যালোচনা না করার কারণে কোন কোন ব্যক্তি ভ্রান্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে পার্থিব চিন্তাবিদগণের একদেশ-দর্শী দৃষ্টিভঙ্গির কারণেও, আবার কোন কোন কাট-মোল্লা জাতীয় ব্যক্তিদের কুপমণ্ডুকতার জন্যও বটে! দৃষ্টান্ত-স্বরূপ

কোন কোন নাস্তিক পণ্ডিত বলেছে : 'ধর্ম হলো জন-গণের নেশা' এবং 'ধর্ম যুক্তিহীন বলে বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাঞ্জস্যহীন।' তেমনিভাবে কাট-মোল্লাদের মধ্যে অনেকে বলেছে : মানুষ কখনই চাঁদে যেতে পারে না—চাঁদে যাওয়ার ব্যাপার নিতান্তই বানাওয়াট ব্যাপার, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, উভয়-প্রকার ধ্যান-ধারণাই মূলত: প্রাকৃতিক বিধান এবং আধ্যাত্মিক বিধান সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণে সৃষ্ট অথবা একটি সম্বন্ধে কম-বেশী জানা থাকা সত্বেও অপরটি সম্বন্ধে সঠিকভাবে না জানার কারণে এই ধরণের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। পবিত্র কুরআনের আলোকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, উভয় বিধানের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য বা বিরোধ নেই।

(ক) প্রাকৃতিকজগৎ : বিশ্ব স্রষ্টার কর্ম-কাণ্ড

প্রাকৃতিক বিধানের অপরিহার্যতা সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা বলেন :

> "আসমান সমুহে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবাই ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক আল্লাহর প্রতি অবনত এবং তাহাদের ছায়াগুলিও সকাল-সন্ধ্যায় সিজদা-রত।" (সুরা আল-রাদ : ১৬)

প্রাকৃতিক বিধানের আওতা থেকে কোন কিছুই স্বাধীন নয়। নিখুঁত নিয়ম-শৃঙ্খলার দ্বারা বিশ্ব-জগত পরিচালিত—কোথাও কোন বৈষম্য বা ত্রুটি নাই (সুরা মূলক : ৪-৫)। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী, আসমানের জোতিষ্ক মণ্ডলী—সৃষ্টি-জগতের সবকিছুই নিয়ম-কানুনের অধীন এবং সকল বিধানের মুল উৎস এবং নিয়ন্ত্রণকারী রয়েছেন 'রহমান' খোদা, যিনি অযাচিত এবং মহান দানকারী।

প্রকৃতি-জগতে আইন-শৃংঙ্খলার অপরিবর্তনীয় সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম ধারা প্রবাহমান রয়েছে বলেই পার্থিব বিজ্ঞানের গবেষণা ফলপ্রসূ হয়েছে, নব নব আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। কিন্তু মহা-বিস্ময়কর এই বস্তু-জগত, অফুরন্ত এর রহস্যজাল, অনুতে পরমাণুতে লুকানো রয়েছে বিস্ময়কর তত্ব ও তথ্যের জ্ঞান-ভাণ্ডার। তাই সত্যিকার বিজ্ঞানীগণ আশ্চর্য হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছেন : "জ্ঞান-সমুদ্র সীমাহীন, কুল-কিনারাহীন।" কিন্তু যারা বিজ্ঞানের সামান্য 'ক' 'খ' শিখেই নিজেদেক বড়ো বিজ্ঞানী ভাবতে শুরু করে তারা অন্তসারশূন্য অহঙ্কারী বিজ্ঞানী (অথবা কু-বিজ্ঞানী) নয় কি? যে জ্ঞান-সমুদ্রের কোন কিনারা নেই—'সমুদ্র পাড়ি দিয়ে কিনারায় পৌঁছেছি' বলে যদি কেউ মনে করে তবে সে কিনারা মনে করে যেখানে নামবে সেখানেই ডুবে মরবে!

'রাব্বুল আলামীন' তথা বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা প্রতিপালক এবং ক্রমোন্নতি দানকারী আল্লাহ্‌তায়ালা বিশ্বব্যাপী প্রকৃতি-জগত এবং উহার পরিচালনার নিমিত্ত সুশৃংখল নিয়মাবলীর ব্যবস্থা করেছেন। সমগ্র প্রাকৃতিক জগত তাঁরই কর্মকাণ্ড (Work of God)। তাই পবিত্র কুরআন অনুযায়ী :

> "তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন সূর্য, চন্দ্র এবং তারকাপুঞ্জ এবং এই সকলই তাঁহার

নির্দেশাধীনে বিনয়াবনত রহিয়াছে। নিশ্চয় এই সৃষ্টি-জগত তাঁহারই এবং পরিচালনামূলক নির্দেশ (অর্থাৎ বিধান) তাঁহারই। জগত সমূহের 'রব' মহা-করুণাময় আল্লাহ্।" (সুরা আরাফ: ৫৫)।

উপরোক্ত আয়াতে 'খালক' (সৃষ্টি) এবং 'আমর' (আদেশ বা বিধান) দ্বারা সৃষ্টি-জগতের অধিকর্তার সৃষ্টি ক্ষমতা এবং সেইসঙ্গে সৃষ্টির উপর আধিপত্য এবং বিধানের পরিচালনার ক্ষমতার কথা বর্ণিত হয়েছে। তাই সৃষ্টি-জগতের পরতে পরতে যে গুপ্ত রহস্যাবলী নিহিত রয়েছে যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী আল্লাহ্‌তায়ালা যথাযথ পরিমাণে সেগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। সুতরাং প্রাকৃতিক জগতের কর্ম-কাণ্ড এবং উহার পরিচালনার মূলে রয়েছেন 'আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন'। আল্লাহ্‌তা'লার 'ফেলী জালওয়া' বা কর্ম-কাণ্ডের মহা-বিকাশ হলো এই প্রকৃতি-জগত।

(খ) ঐশীবাণী সম্বলিত আধ্যাত্মিক বিধান

মানুষ হলো সৃষ্টিজগতের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি। 'খালাকনা তাফজিলা'—সুরা বনী ইস্রায়েল: ৭০) এবং সর্বোৎকৃষ্ট উপাদানে সৃজিত ('আহসানে তাকবীম'—সুরা তীন: ৫)। তাই মানুষ একদিকে প্রাকৃতিক বিধানের অধীন। তাই প্রাকৃতিক বিধান লঙ্ঘনের ফলে মানুষ পার্থিব এবং দৈহিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পক্ষান্তরে শুধু মানুষের জন্যই খোদাতায়ালা কর্তৃক বিশেষভাবে মনোনীত প্রতিনিধি তথা নবী-রসুলের মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে আধ্যাত্মিক বিধান।

ঐশী বিধান অস্বীকার করলে মানুষ ঐশী-কোপগ্রস্ত হয়ে ঐশী-শাস্তির যোগ্য হয় (যদিও মহাকরুণাময় আল্লাহ তাঁর মহাজ্ঞানে ব্যক্তি বা জাতি বিশেষকে কখনও ক্ষমা করে দেন অথবা শাস্তি স্থগিত অথবা বিলম্বিত করে সংশোধনের সুযোগ দেন)। যেহেতু সৃষ্টি-জগতের মধ্যে একমাত্র মানুষের জন্য আধ্যাত্মিক বিধানের ব্যবস্থা রয়েছে এবং মানুষকে সেই বিধান মানা অথবা না মানার 'ইচ্ছা-স্বাধীনতা' দেওয়া হয়েছে—সেইজন্য মানুষের জন্য বিচার ও শাস্তি অথবা পুরস্কারের ব্যবস্থাও রয়েছে (অন্য কারো জন্য এই ব্যবস্থা সার্বিক অর্থে প্রযোজ্য নয়)। তাই মানুষের জীবন যেমন দায়িত্বপূর্ণ ও বিপদ-সংকুল, তেমনি মহা-সম্ভাবনাময়। তাই আল্লাহ বলেন:

"নিশ্চয় আমরা আধ্যাত্মিক বিধানরূপ 'আমানত' দান করিতে চাহিয়াছিলাম আকাশ-মালাকে, পৃথিবীকে এবং পর্বতমালাকে; কিন্তু তাহারা এই দায়িত্ব লইতে রাজী হয় নাই এবং তাহারা ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু মানুষ এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। সত্যিই, সে ইহার প্রতি অন্যায়ও করিতে পারে এবং অবহেলাও করিতে পারে।" (সুরা আহযাব: ৭৩)

ঐশী বিধানের দায়িত্ব এমন এক অপরিসীম দায়িত্ব, যা বিশ্বের আর কেউ বহণ করতে অক্ষম—একমাত্র মানুষ ব্যতীত। মানুষের উপর আল্লাহতায়ালা জোর করে কিছু চাপাতে চান না। মানুষকে ইচ্ছা-স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে (সুরা হামীম আল-সিজদা: ১২)।

ঐশী-বিধান পালন করার ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তী নেই—কারণ সত্য ও মিথ্যার মধ্যস্থিত প্রভেদ দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টরূপে উদ্ভাসিত (সুরা বাকারা : ২৫৭)। মানুষের হেদায়েত তথা পথ-প্রদর্শনের জন্য নবী-রসুলগণকে আল্লাহতালা প্রেরণ করেছেন ঐশীবানী (word of God) সহযোগে। মানুষের ইচ্ছা-স্বাধীনতা এবং তার পরিণতি সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা বলেন :

> তুমি কি দেখ না যে, আসমানসমুহে যাহারা আছে এবং পৃথিবীতে, সূর্যে, চন্দ্রে এবং তারকাপুঞ্জে এবং পাহাড়-পর্বতে ও বৃক্ষে যাহারা আছে, এবং পশু-পাখি এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই আল্লাহর সমীপে সিজদা-প্রণত রহিয়াছে ? কিন্তু অনেকেই এরূপ রহিয়াছে যাহারা শাস্তিযোগ্য। আল্লাহ যাহাকে অপমাণিত করেন তাহাকে কেহই সম্মানে ভূষিত করিতে পারে না, নিশ্চয় আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন।" (সুরা হজ্জ : ১৯)

এই আয়াতের প্রথমাংশে মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সকলকেই বাধ্যতামূলকভাবে ঐশী বিধানের অধীন করা হয়েছে। কিন্তু শেষাংশে বলা হয়েছে যে মানুষের মধ্যে অনেকেই আল্লাহর প্রতি সিজদা-প্রণত এবং অনেকেই অবাধ্যতার কারণে শাস্তিযোগ্য। সৃষ্টি-জগতের অন্য কাহারও জন্য এই ব্যবস্থা করা হয় নাই। সুতরাং ভাল ও মন্দের মধ্যে নির্বাচন (Choose) করার অধিকার এবং ফলশ্রুতিতে পুরস্কার অথবা শাস্তির ব্যবস্থা শুধু মানুষের জন্যই প্রযোজ্য।

বিশ্ব-জগতের এক মহা-বিস্ময়কর সৃষ্টি হলো মানুষ যাকে 'বিশ্ব-জগতের ক্ষুদ্রতম সংস্করণ' (Universe in miniature) বল্লেও অতুক্তি হয় না। মানব-দেহ ও মানবাত্মার মধ্যে প্রতিফলিত রয়েছে বিশ্ব জগতের বহু উপাদান এবং উপাদানসমুহ হতে পরিশ্রুত শক্তি ও সম্ভাবনা। বিশেষ করে ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা অহী-ইলহামের আকারে তার আত্মার মধ্যে সুপ্ত রয়েছে (সুরা শামস : ৮-৯)। বিশ্ব-সৃষ্টির কেন্দ্র-বিন্দু হলো মানুষ এবং মানব-জাতির কেন্দ্র-বিন্দু হলো যুগ-নবী এবং সকল যুগের সকল নবীর কেন্দ্র-বিন্দু হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) –খাতামুল মুরসালীন এবং রহমাতুল্লিল আলামীন। আধ্যাত্মিক বিধান যুগে যুগে বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে উন্নতির স্তর সমুহ অতিক্রম করে পবিত্র কুরআনের আকারে পূর্ণতম বিধানের রূপ পরিগ্রহ করেছে (Perfect Word of God) (সুরা মায়েদা : ১ম রুকু)।

গ প্রাকৃতিক বিধান ও অধ্যাত্মিক বিধানের মধ্যে সামঞ্জস্য

প্রকৃতি-জগত হলো খোদার কর্ম-কাণ্ড (Word of God) এবং আধ্যাত্মিক বিধান হলো খোদার বাণী (Word of God)। খোদার কাজ ও কথার মধ্যে কোন বিরোধ নেই—কারণ খোদাতালার মধ্যে কোন স্ব-বিরোধিতা নেই।

আল্লাহর কথার কোন সীমা নেই। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে পৃথিবীর সমস্ত গাছ-পালা

যদি কলম রূপে ব্যবহৃত হয়, যদি সমুদ্র—তার সঙ্গে আরো সাতটি সমুদ্র যদি সংযুক্ত করে —কালি-রূপে ব্যবহৃত হয়, তবুও আল্লাহর কথা নিঃশেষিত হবে না।" (সুরা লুকমান : ২৮)। তেমনিভাবে আল্লাহতা'লার সৃষ্টি-জগতের বিষয়-বস্তু, প্রাণী, বৃক্ষলতা, আকাশ-মণ্ডলী গ্যালাক্সীসমূহ ইত্যাদির সংখ্যা, পরিমাণ, দূরত্ব ইত্যাদি বিষয়েরও কোন সীমা-পরিসীমা নেই। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন : "আমরা স্বহস্তে আকাশ তৈরী করেছি এবং নিশ্চয়ই আমরা অসীম শক্তির অধিকারী (অর্থাৎ আরো বিস্তৃতি দানের ক্ষমতা আমরা রাখি) আর পৃথিবীকে আমরা বিস্তৃত করেছি এবং কত সুন্দরভাবে আমরা ইহাকে বিস্তৃতি দান করেছি।" (সুরা যারিয়াত : ৪৮-৪৯)।

মানুষের হেদায়েতের জন্য পবিত্র কুরআনে আধ্যাত্মিক বিষয়াবলীর বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিক নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং রহস্যাবলীর অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। এই সকল বিষয়ের কোন কোনটি আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি। আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান-জগতে এমন কিছু আবিস্কৃত হয় নাই যা ১৪০০ বছর পূর্বে নাযেলকৃত পবিত্র কুরআনের শিক্ষার বিরুদ্ধে গিয়েছে। বরং অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের শত শত বছরের ভ্রান্ত ধারণার মূলোৎপাটন করেছে পবিত্র কুরআন। ফলতঃ খোদার বানী সম্বলিত কুরআন করীমের শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের সত্যিকার আবিষ্কার সমূহের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। বিরোধ হলো তাদের জন্য যারা ভালভাবে কুরআন করীম জানেন না এবং সেই সকল কাট-মোল্লাদের জন্য যারা বিজ্ঞানেরও কিছু বুঝেন না এবং পবিত্র কুরআনও সঠিকভাবে জানেন না। এই কারণে ইসলাম প্রথম যুগ হতেই পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক উভয় বিষয়ে জ্ঞানার্জনের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে (সুরা আলাক, মুজাদিলা : ১২, তা-হা : ১১৫) এবং প্রকৃতি-জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করতে নির্দেশ দিয়েছে (সুরা আল-ইমরান : ১৯০)।

(ঘ) সর্বজ্ঞানের স্তর

অজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিশুর জীবন যাত্রা শুরু হয়। তারপর দ্বিতীয় স্তরে সে পরিবেশ থেকে দেখে-শুনে সাধারণ জ্ঞান লাভ করে। তৃতীয় স্তরে সে বই-পুস্তক এবং বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে কোন বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করে এবং বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞানী বলে পরিচিত হয়। পার্থিব জ্ঞান-জগতে অজ্ঞতা, সাধারণ জ্ঞান এবং বিজ্ঞান—এই তিনটিই হলো জ্ঞানের প্রধান স্তর। পক্ষান্তরে আধ্যাত্মিক জগতের ক্ষেত্রে জ্ঞান লাভের জন্য খোদাতালার কাছ থেকে অহী-ইলহামের মাধ্যমে ঐশীবানী লাভ করতে হয়। মানুষের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য ঐশীবানীর খুবই প্রয়োজন। কেননা এই প্রাকৃতিক জগত এবং প্রাকৃতিক বিধানের কি মূল্য রয়েছে যদি মানুষ বিজ্ঞানের জ্ঞানকে সঠিক পথে প্রয়োগ করতে না পারে? সার্বিকভাবে মানুষের পথ-প্রদর্শনের জন্য এবং সেইসংগে বিজ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য ধর্ম এবং ধর্মীয় আদর্শের প্রয়োজন। সেই ধর্মীয় শিক্ষা ও আদর্শের মূল ভিত্তি হলো খোদার বানী। আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে এই ঐশীবানী-লব্ধ জ্ঞানকে আমরা মহাজ্ঞান বলতে

পারি যার মহা-বিকাশ ঘটে নবী-রসুলের মাধ্যমে। মানব-জাতির সার্বিক কল্যাণ এবং পথ-প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে লক্ষাধিক নবী-রসুলের আবির্ভাবের দ্বারা এই কথা সপ্রমাণিত।

এই সকল জ্ঞান এবং জ্ঞানের স্তরের উপর রয়েছে সর্বজ্ঞানের স্তর তথা সর্বজ্ঞানী খোদাতালার অস্তিত্ব। আল্লাহতালা সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞানী। আল্লাহ বলেন : "আমি আসমান সমুহের এবং পৃথিবীর গুপ্ত বিষয়াবলী সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত" (সুরা বাকারা : ৩৫)। "নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞানী এবং তিনি সকল বিষয় খবর রাখেন" (সুরা নেছা : ৩৬)। "সকল বিষয়ে তার জ্ঞান রয়েছে" (সুরা আনাম : ১০২)। আল্লাহ ব্যতীত কেউ কি সর্বজ্ঞানী এবং সর্ব-শক্তিমান হওয়ার দাবী করতে পারে ?

সর্বজ্ঞানী আল্লাহতালার সমীপে আমরা সকাতর প্রার্থনা জানাই যাতে আমরা পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানে আরো উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করতে থাকি এবং বৈজ্ঞানিক আবিস্কারসমুহকে সত্যিকার অর্থে মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ঐশীবানী সম্বলিত পূর্ণতম আধ্যাত্মিক বিধান তথা পবিত্র কুরআনের অনুসৃত পথ ও পন্থা অবলম্বন করি। পবিত্র কুরআন ও বিজ্ঞানের যুগপৎ প্রয়োগ এবং সম্মিলিত পদক্ষেপ দ্বারাই সমস্যা-বিক্ষুব্ধ মানব-সভ্যতা কল্যান ও মুক্তির পথ লাভ করবে। (ক্রমশঃ)

—মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

শুভ বিবাহ

বিগত ৮ই আগষ্ট ১৯৮৩ বাদ জুময়া ঢাকা কেন্দ্রীয় আহমদীয়া মসজিদে তারুয়া (থানা —ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) নিবাসী মরহুম মুন্সী ওয়ালী আহমদ (ওরফে সানুমিয়া)-এর পুত্র জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমদের শুভ-বিবাহ গ্রাম—চুনকুটিয়া (থানা কেরানীগঞ্জ—ঢাকা) নিবাসী জনাব মোঃ ফয়েজউল্লাহ সাহেবের কন্যা মুসাঃ সুলতানা রাজেয়ার সহিত ২৫০০০. (পঁচিশ হাজার টাকা) দেন-মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী উক্ত বিবাহ সর্বতোভাবে বাররকত হওয়ার জন্য সবিশেষ দোওয়া করিবেন।

দোওয়ার আবেদন

(১) এবার যাহারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১লা সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য পাশ এবং সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিতে যাইতেছ তাহাদের সকলের পূর্ণ কামিয়াবীর জন্য জমাতের সকল ভাই ও বোনের নিকট খাছ ভাবে দোওয়ার আবেদন যানাইতেছি। দোয়া-প্রার্থী—

—মোহাম্মদ আজাহার উদ্দিন খন্দকার

(২) "আমার দ্বিতীয় ছেলে শেখ মোবারক আহমত দীর্ঘকাল যাবৎ অসুস্থ। বর্তমানে পূর্ণ সুস্থ না হওয়া সত্বেও কিছুটা অসুস্থ অবস্থায়ই ঢাকাস্থ সোনালী ব্যাংকের হেড অফিসে কর্ম্মরত আছে। পূর্ণ সুস্থতার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগিনীর খেদমতে দোওয়ার আবেদন করিতেছি।—শেখ আবদুল আলী, (অবসরপ্রাপ্ত) পোষ্টমাষ্টার, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

আহ্! মওলানা মালেক খান আর ইহ-জগতে নাই!!

দুঃখ-বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই মর্মন্তুদ সংবাদটি জানাইতে হইতেছে যে, আহমদীয়ত তথা ধর্মাকাশের একটি উজ্জল জ্যোতিষ্ক—সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার নাজের ইসলাহ ও ইরশাদ—পাক-ভারত মুক্তি আন্দোলনের বীর মুজাহেদীন (আলী ব্রাদার্স)-এর জেষ্ঠা ভ্রাতা খান সাহেব যুলফিকার আলী গওহার (রহঃ)-এর মহান পুত্র হযরত মওলানা আবদুল মালেক খান সাহেব বিগত ৫ই আগষ্ট ১৯৮৩ রাবওয়া হইতে লাহোর যাত্রাপথে চুড়কানা মোকামের নিকট তাঁহার মোটর কারের সহিত ভুল পথে চলিত একটি ট্রাকের সংঘর্ষ জনিত দুর্ঘটনায় শাহাদাত বরণ করেন—ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

তিনি ধর্ম-জগতের একজন মহাজ্ঞানী সত্যিকারের রব্বানী আলেম এবং অসাধারণ বাকশক্তি সম্পন্ন হৃদয়গ্রাহী সুবক্তা ছিলেন। আজীবন তিনি ইসলামের প্রভূত খেদমত সাধনের তওফিক লাভ করেন। বাংলাদেশেও তিনি কয়েকবার দ্বীনি সফরে আগমন করেন। তাঁহার সারগর্ভ ও মর্মস্পর্শী ভাষণ এবং অমায়িক ও সুমধুর ব্যবহার এখানকার আহমদী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা কখনও ভুলিতে পারিবে না। তাঁহার আকস্মিক ইন্তেকালে আমরা ব্যথিত হৃদয়ে আল্লাহ্-তায়ালার দরবারে দোওয়া জানাই, যেন তিনি মরহুমকে জান্নাতুল ফেদৌসে উচ্চ মর্যাদা দান করেন, তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন তথা জামাতের সকলকে 'সবরে জামীল'—উত্তম ধৈর্যধারণের ও স্বস্তিলাভের তওফিক দান করেন এবং তাঁহার শূন্য-স্থানকে উৎকৃষ্ট উপায়ে পূর্ণ করেন। আমীন।

—**আহমদ সাদেক মাহমুদ** সদর মুরুব্বী

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ জামাতের প্রবীন আহমদী জনাব এ, এফ, মোহাম্মদ আবদুল হাই সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র মোসাদ্দেক আহমদ (২০) গত ২৮শে জুলাই বৃহস্পতিবার পার্শ্ববর্তী খালে গোছল করতে গিয়ে পানিতে ডুবে ইন্তেকাল করেন—(ইন্নালিল্লাহে·····রাজেউন)।

উল্লেখ্য যে, মরহুম ঢাকায় থাকা কালে শান্তিনগর মগবাজার মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার মোতামাদের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

মরহুম একজন মোখলেছ আহমদী, নিষ্ঠাবান খাদেম ছিলেন। আল্লাহতায়ালা তাঁর রুহের মাগফেরাত দান করুন, এবং তার শোক-সন্তপ্ত পিতা-মাতা ভাই-বোনদের ধৈর্যধারণ ও স্বস্তিলাভের জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।—**ইব্রাহেতুল হাসান** ঢাকা।

শোক সংবাদ

আহমদনগর জামাতের ভুতপূর্ব প্রেসিডেন্ট ও বর্তমানে বায়তুল মাল ইনসপেক্টর জনাব মোঃ বেলাল হোসেন খান সাহেবের মাতা গত ৮-৮-৮৩ইং সকাল ৮-৩০ মিনিটে আহমদনগরে তাঁহার নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে·····রাজেউন। মৃত্যু কালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৬ বৎসর। তিনি বনগ্রামের বাড়ীতে থাকাকালীন ১৯৬৭ইং সালে তবলীগে-খাসের সময় আহমদীয়াতের পয়গাম পান এবং বয়েত গ্রহণ করেন। তাহার রুহের মাগফেরাতের জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট খাসভাবে দোওয়ার আবেদন জানাইতেছি।

নিবেদক—**এ, কে, এম, নূরুল ইসলাম খান**

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্ম-তৎপরতা

তরবিয়তী ক্লাশ ঃ

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজলে গত ৫ই আগষ্ট শুক্রবার হতে ১২ই আগষ্ট শুক্রবার পর্যন্ত ৮দিন ব্যাপী শাহবাজপুর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার তরবিয়তী ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়। বাদ জুমা উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট ডাঃ আবদর আলী সাহেব। এ ক্লাশে ১১ জন খোদ্দামের মধ্যে ৯জন খোদ্দাম ও ৭জন আতফাল অংশগ্রহণ করে কায়দা হাসিল করেন। ক্লাশ পরিচালনা করেন বাংলাদেশ মঃ, খোঃ আঃ-এর নাযেম উমুরে তুলাবা খন্দকার বেনজীর আহমদ এবং কুমিল্লা মজলিসের কায়েদ জনাব মোহাম্মদ আবুল কাশেম সাহেব। এ ছাড়া জামাতের মোয়াল্লেম জনাব আবুল কাশেম আমসারী সাহেবও শেষ ৫দিন তরবিয়তী ক্লাশে শিক্ষা দান করেন।

ক্লাশ পরিদর্শনের জন্য মোহতারম ন্যাশনাল কায়েদ সাহেব, ন্যাশনাল মোতামাদ ও জেলা কায়েদ সাহেব আগমন করেন। সমাপ্তি অধিবেশনে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করেন যয়ীমে আলা ডাঃ নাজির আলী সাহেব।

বৃক্ষ রোপন অভিযান ঃ

গত মাসে কুমিল্লা মজলিস বৃক্ষ রোপন অভিযানে অংশ গ্রহণ করে এবং ফল-ফলাদির বৃক্ষ রোপন করে। এতে ৫জন খাদেম অংশগ্রহণ করে।

মজলিস পরিদর্শন ঃ

মোহতরম ন্যাশনাল কায়েদ জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ এবং ন্যাশনাল মোতামাদ জনাব মোতামাদ জনাব মোহাম্মদ আবদুল জলিল এবং সিলেট ও কুমিল্লা জেলার জেলা কায়েদ জনাব মোহাম্মদ আবদুল হাদী গত ৫ ও ৬ই আগষ্ট ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও শাহবাজপুর মজলিস পরিদর্শন করেন।

অনুরূপভাবে জেলা কায়েদ জনাব আবদুল হাদী সাহেব ও জেলা মজলিসের নাযেম-গণ ঘাটুরা, বিষ্ণুপুর ক্রোড়া, শালগাঁও, কুমিল্লা, খড়মপুর, শাহবাজপুর, ভাদুঘর, তারুয়া ও জামালপুর (সিলেট) মজলিশগুলি পরিদর্শন করেন। (—বাঃ মজলিসে খোদ্দামুল আঃ)

কৃতি ছাত্রী

আমার একমাত্র কন্যা মোসাঃ নুসরৎ জাহান (লিপি) গত ১৯৮২ইং সনে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় ২য় গ্রেডে বৃত্তি পাইয়াছে। তাহার জন্য সকল আহমদী ভাই ও বোনের নিকট দোয়া প্রার্থী। —মোঃ নজরুল ইসলাহ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত
বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ্‌ মাওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

(এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহমদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং লাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মানা করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar